নসুমামা ও আমি

(গল্পগ্রন্থ – উপলখণ্ড)

ছেলেমানুষ তখন আমি। আট বছর বয়স।

দিদিমা বলতেন, তোর বিয়ে দেব ওই অতুলের সঙ্গে।

মামার বাড়িতে মানুষ, বাবা ছিলেন ঘর-জামাই—এসব কথা অবিশ্যি আরও বড় হলে বুঝেছিলাম।

অতুল আমার দিদিমার সইয়ের ছেলে, কোথায় পড়ে, বেশ লম্বামত আধফর্সা গোছের ছেলেটা। আমাদের রান্নাঘরে বসে দিদিমার সঙ্গে আড্ডা দিত। অতুলকে আমার পছন্দ হতো না, কেমনধারা যেন কথাবার্তা। আমায় বলতো—এই পাঁচী, যা—এখানে কি? ওইদিকে গিয়ে খেলা করগে যা—

কখনও বলতো—অমন দুষ্টুমি করবি তো বাঁশবনে লম্বা শেয়ালটা আছে তার মুখে ফেলে দিয়ে আসবো বলে দিচ্চি—

অতুলকে সবাই বলতো ভাল ছেলে। লেখা-পড়ায় বছর বছর ভাল হয়ে ক্লাসে উঠতো, আমার ছোট মামার সঙ্গে কি সব ইংরিজি-মিংরিজি বলতো—যদি তার কিছু বুঝি!

এসব জন্যেই হয়তো অতুলকে আমার মোটেই ভাল লাগত না। তা সে যতই ভাল হোক, লোকে তাকে যতই ভাল বলুক।

ভাল আমার লাগতো মুখুজ্যে-বাড়ির নসুকে। কি সুন্দর ফর্সা চেহারা, ননী-ননী গড়ন, ডাগর চোখ-দুটি, বেশ হাসি-হাসি মুখখানি। বয়সও অতুল মামার মত অত বেশি নয়, আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় হবে। অতুল মামার বয়েস হয়তো ছিল ষোলা-সতেরো।

নসু হাসলে তার মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরতো—দিদিমার সেই গল্পের মত। এমন সুন্দর মুখ আমার আট বছরের জীবনে এ অজ পাড়াগাঁয়ে ক'টাই বা দেখেছি! দিদিমার কাছে এসে বসে মাঝে মাঝে সেও গল্প করতো, সে যা বলতো তা যেন মধুর, অতি মধুর! আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে একমনে ওর কথাগুলো যেন গিলতাম। অতুলও তো কথা বলে, কিন্তু তার কথা এত ভাল লাগতো না তো?

দিদিমা বলতেন—অতুলের সঙ্গে পাঁচীর বিয়ে দেবো, বেশ মানাবে।

আমি মুখ ভারী করে বলতাম—ছাই মানাবে।

দিদিমা হেসে বলতেন—ওমা মেয়ের কাণ্ড দ্যাখো। কেন মানাবে না?

—তুমি তো সব জানো!

—তবে তোর মনটা কি শুনি? কাকে বিয়ে করবি তুই?

—ওই নসুকে।

দিদিমা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতেন—এর মধ্যেই মেয়ে নিজের বর বেছে নিয়েচে। ধন্যি যা হোক, একালের মেয়ে কি না! শুনলে সই, নসু নাকি ওর বর হবে।

অতুলের মা হেসে বলতেন—কেন রে, অতুলকে তোর পছন্দ হয় না কেন?

—অতুল মামার বয়েস বেশি।

—বেশি আর কত? ষোল বছর।

—তা যাই হোক, ষোল বছরের বুড়োকে আমি বুঝি বিয়ে করবো? নসু ছেলেমানুষ।

দিদিমা বলতেন—দ্যাখো সই একালের মেয়ের কাণ্ড। নসুর বয়স বারো, ওকেই বেশি পছন্দ। তোমার আমার কাল চলে গিয়েচে। তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো, উনি তখন বিয়াল্লিশ, দোজপক্ষে আমায় ঘরে আনলেন। তোমারও তো—

অতুলের মা বল্লেন—আমার অত না! উনি তখন ঊনত্রিশ, আমার এগারো।

—দোজপক্ষ তো বটে।

—শুধু তাই? সতীন বেঁচে।

—আমায় ভগবান সেদিক থেকে নিষ্কণ্টক করেছিলেন তাই খানিক রক্ষে।

মাঝে মাঝে নসুকে অনেকদিন দেখতাম না। আমাদের পাড়ায় সে আসতো না খেলতে। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো, ছুটে যেতাম মুখুজ্যেবাড়িতে।

নসুমামা উঠোনে বসে কঞ্চি কেটে খেলাঘরের বেড়া বাঁধছে। সঙ্গে আরও তিন-চারটি ছেলে, ওরই বয়সি।

আমি বলতাম—ও নসুমামা, আমাদের বাড়ি যাওনি যে?

—কি রোজ রোজ যাবো! তুই এতদূর এলি যে? আসতে ভয় করে না?

—না।

—খেলা করবি?

—হুঁ।

অন্য ছেলেগুলো তখুনি বলে উঠতো—মেয়েমানুষ আবার আমাদের সঙ্গে খেলবি কেন? যা তুই, পুঁটি মান্তিদের সঙ্গে খেলগে যা।

নসু বলতো—খেলুক আমাদের সঙ্গে—তাতে কি।

হাবু বলতো—ও কিদাদিয়ে কঞ্চি কেটে আনতে পারবে? কি খেলা হবে ওকে নিয়ে? যা তুই—

আমাকে কাঁদো-কাঁদো দেখে নসু এসে হাত ধরতো। বলতো—কেন ওকে অমন কচ্ছিস তোরা? ও কেন কঞ্চি কাটতে যাবে? মেয়েমানুষ, চুপ করে বসে থাকবে। বোস তুই পাঁচী—

আমি অমনি কৃতার্থ হয়ে উঠোনের একপাশে বসে পড়তাম। নসুমামা খেলতে খেলতে হয়তো একটা পেয়ারা ছুঁড়ে দিত আমার দিকে। বসে বসে পেয়ারা চিবুতাম। অনেকক্ষণ পরে বলতাম—নসুমামা, খিদে পেয়েচে—

হাবু অমনি বলে উঠতো—ওই শোনো কথা। ও সব হ্যাঙ্গাম—

নসুমামা বলতো—তুই চুপ কর্ হাবু। খিদে পেয়েচে? চল্ পিসিমার কাছে, দুটো চালভাজা খাবি তেলনুন দিয়ে, না হয় একটা কচি শসা পেড়ে দেবো—

আমি বলতাম—না, তুমি বাড়ি দিয়ে এসো। আমি বাড়ি গিয়ে ভাত খাবো। একলা যেতে ভয় করে।

হাবু অমনি চোখ পাকিয়ে বলে—তবে একলা এলি কি করে? কে এখন তোর সঙ্গে যাবে পৌঁছে দিতে?উঃ, ভারি পাজি মেয়ে—

নসু আমার আগে আগে বাড়ি পৌঁছে দিতে আসতো, ধুলোমাটির পথের ধারে কত কেঁচোর মাটি, কত বেনে-বৌ গাছে গাছে, পাকা বকুল পড়ে থাকতো বকুলতলায়। নসুকে পাকা বকুল খাওয়াতে ইচ্ছে করতো, আমি বড্ড ভালবাসি পাকা বকুল। নসুমামাকে কুড়িয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে বলতো—দূর, ও কষা কষা লাগে। তুই খা, আমি খাবো না। নসুকে খেতে দিয়ে যেন আমার তৃপ্তি, সে সুযোগ ও আমায়দিত কই।

এইভাবে সারা শৈশব ও বাল্যকাল কেটে গেল সেই আমার ছেলেবেলাকার অতিপরিচিত মামার বাড়ির গ্রামের গাছপালার ছায়ায় ছায়ায়, চৈত্র মাসের পাখি-ডাকা শীতল সকালবেলাকার মত। তারপরেই জীবনের রোদ খরতর হয়ে উঠলো ক্রমশ। ফুল-ফোটা পাখি-ডাকা বসন্তপ্রভাত গেল ধীরে ধীরে মিলিয়ে। বাতাস গরম হয়ে উঠলো।

সেই গাঁ, সে-ই তাঘরা-শেখহাটি এখনও আছে। মাঝে মাঝে এখনও সেখানে যাই, কত বদলে গিয়েছে সে জায়গা। সে মামার বাড়ি নেই, সে দিদিমাও নেই।

বাবা কোথায় কাদের আড়তে কাজ করতেন। সামান্য ক'টি টাকা মাইনে পেতেন, দিদিমার সঙ্গে সংসারের খরচপত্র নিয়ে তাঁর প্রায়ই ঝগড়া-তর্ক হোত। বাবা রাগ করে চলে যেতেন বাড়ি থেকে, দু-একমাস কোনো খবর আসতো না, মা কান্নাকাটি করতেন, হঠাৎ বাবা একদিন এসে হাজির হোতেন। দিন এভাবেই চলতো।

তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো আড়ংঘাটার কাছে এক গ্রামে। বিয়ের দিনকতক আগে নসুদের বাড়ি গিয়েছিলাম। নসুর মার শরীর খারাপ, নসু রান্নাঘরে ভাত রাঁধছে। উনুনের আঁচে ওর ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে। ওদের বাড়ির কোনো বিলিব্যবস্থা নেই। অনেকগুলো ভাই নসুর, তারা কেউ বাইরে পড়ে, কেউ কাজ করে। নসুর মার শরীর চিররুগ্‌ণ, সংসারের রান্নাবান্নার ভার নসুমামার উপর। আজ অনেকদিন থেকেই নসুর এই অবস্থা দেখছি।

নসুর অবস্থা দেখে সত্যিই কষ্ট হলো। নসুর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই, ভাইয়েরা সব স্বার্থপর, সংসার চালানোর ভার ওর ওপর ফেলে দিয়ে সবাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে।

নসুমামা আমায় দেখে হেসে বল্লে—আয় পাঁচী, বোস। কাল দই পেতেছিলাম, দইটা বসেনি। উনুনের পাড়ে রেখে দেবো, কি বলিস?

যত সব মেয়েলি গল্প নসুর। সাধে কি ওকে সকলে বলে জনার্দন মুখুজ্যের বিধবা মেয়ে?

আমায় বল্লে—কাল বুঝলি, এক কাঠা মুগের ডাল ভাজলাম, ভাঙলাম। বেলা গেল ডালডুল করতে। গা-হাত-পা ব্যথা।

বল্লাম—তুমি ডাল ভাজলে? সত্যি?

—হ্যাঁ রে। নইলে কে করবে? আবার কাল একগাদা ময়লা কাপড় সোডা-সাবান দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে।

দুঃখিত সুরে বল্লাম—ওসব মেয়েলি কাজ। তুমি ওসব কর কেন? আমায় ডাকলে না কেন? আমি ডাল ভেজে দিতাম।

নসু বল্লে—আহা! আমি না পারি কি? তোকে আবার ডাকতে যাব কেন?

—লেখাপড়া করবে না নসুমামা? এসব কাজ কি তোমার সাজে? পুরুষমানুষ,লেখাপড়া কর।

—আমায় কে পড়াবে? দাদারা এক পয়সা দেবে না। তা ছাড়া মার শরীর খারাপ, আমি বাড়ি থেকে গেলে রান্নাবান্না কে করে বল্‌। পড়বার খরচ জুটলেও আমার পড়া হোত না।

আমি বসে বসে ওর কুটনো কুটে দিলাম। আমার বিয়ের কথা বল্লাম। নসুমামা বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলে না। ও যদি একটুও আগ্রহ প্রকাশ করতো, শুনতো কোথায় আমার বিয়ে হচ্চে ইত্যাদি, তাহলে আমার ভাল লাগতো। কিন্তু নাঃ, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই। নসুমামা একটা কথাও জিজ্ঞেস করলে না সে সম্বন্ধে।

আমার বিয়ের রাত্রে নসু নেমন্তন্ন খেয়ে এল পেট পুরে, কিন্তু না এল একবার বিয়ে দেখতে, না একবার বাসরঘরে উঁকি মেরে দেখলে। আমার মনটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ও যদি আসতো তবে খুব ভাল লাগতো। মনের মধ্যে ডুব দেবার সময় আমার নয় তখন, তবুও কি যেন একটা হয়ে গেল, এত বাজনা, এত খাবার-দাবার, এত লোকজনের যাতায়াত, আমার নতুন কাপড় গয়না—কিছুই ভাল লাগলো না। মনে উৎসাহ নেই।

আগেই বলেচি আমার বিয়ে হয়েছিল আড়ংঘাটার কাছে শিকারপুরে। স্বামীর বয়সও সতেরো-আঠারোর বেশি নয়, রোগা চেহারা, মাথার চুল-ওঠা। বিয়ের পরে জানা গেল স্বামী ম্যালেরিয়ার পুরনো রোগী। মাসে দুবার ম্যালেরিয়া জ্বর বাঁধা আছেই। আড়ংঘাটার যুগলকিশোর ঠাকুরের মেলার সময় ময়রার দোকান খোলেন আমার খুড়শ্বশুর, স্বামী তাড়ু দিয়ে সন্দেশ-মুড়কি ভিয়েন করেন।

শ্বশুরবাড়িতে যাবার সময় মনে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে যে না গিয়েছিলাম এমন নয়। না জানি কেমন বাড়ি-ঘর, কেমন খাওয়া-দাওয়া। গিয়ে দেখি, পুরনো আমলের ইঁট-বের-করা কোঠাবাড়ি, দুটি মাত্র ঘর, ছোট

একটা বারান্দা, তবে সব ঘরগুলির সামনে সান-বাঁধানো টানা রোয়াক এবং রান্নাঘরটিও কোঠা। খুব বড় একটা আম গাছ সমস্ত বাড়ির উঠোন জুড়ে ঘুপসি করে রেখেচে।

আমার শাশুড়ি গর্বের সুরে বল্লেন—আমের সময় তো আসচে, দেখো বৌমা। এমন আম এ অঞ্চলে নেই আমার বাগানে যা আছে, ডাকসাইটে বাগান, কর্তা করে রেখে গিয়েছিলেন, এস্তেক গোয়াড়ি, এস্তেক শান্তিপুর, কোথা থেকে কলমের চারা এনে না পুঁতেচেন!

আমের সময় এল, কোথা থেকে ব্যাপারীরা এসে বাগান কিনে নিলে। দু-এক ঝুড়ি আম যা আমাদের বাড়ি এল, তা থেকে দুটো-একটা জুটল আমার ভাগ্যে। শাশুড়ি নিতান্ত বাজে কথা বলেন নি, আম ভাল।

স্বামীর সঙ্গে আলাপ জমলোমন্দ নয়। ক্রমে তাঁকে ভালও লাগলো।

আমায় বল্লেন—তুমি কি খেতে ভালবাসো?

আমি লজ্জা-টজ্জার ধার ধারিনে, বলে ফেল্লাম—তেলেভাজা খাবার।

স্বামী বল্লেন—দূর! অমন বোকা মেয়ে কেন?ভাল খাবারের নাম করো।

—গজা। জিলিপি।

—কেন খাজা?

—সে আবার কি গা? আমাদের গায়ে শুনিনি তো।

উনি হো হো করে হেসে বল্লেন—পাড়াগেঁয়ে ভূত! আমাদের এ শহর বাজার জায়গা। কাল খাজা আনবো লুকিয়ে। কিন্তু সাবধান, মা যেন টের না পায়। বক্‌বে। আমি নিজে খাজা ভিয়েন করি।

সেই থেকে মাঝে মাঝে স্বামী লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার আনেন। কোনোদিন খাজা, কোনোদিন মিহিদানা। আমরা দু'জনে লুকিয়ে খাই। স্বামী বলেন—সবাইকে দিতে গেলে চলে না। খুড়তুতো ভাইয়েরা হাঁসের পাল, সবার মুখে দিতে গেলে তোমার আমার মুখে এক টুকরো উঠবে কি না উঠবে।

শ্বশুরবাড়ি ভাল লাগলো না বটে, তবে স্বামীকে কিছুটা ভাল লাগলো এই খাবার খাওয়া থেকে। উলোর জাতের মত বড় মেলা এ অঞ্চলে নেই, সে সময় ময়রার দোকানে কাজ বেশি। উনি ফেরেন অনেক রাতে। হাতে বড় বড় ঠোঙায় খাবার ভর্তি। উনি হেসে বলতেন—খাও, খাও, খুব খাও—এসো দুজনে পেট ভরে খাই।

একদিন কি করে খুড়শ্বশুর টের পেলেন লুকিয়ে খাবার আনার ব্যাপারটা। এ নিয়ে খুব ঝগড়া হলো বাড়িতে। আমাকে আর ওঁকে যথেষ্ট অপমান গালি-গালাজ সহ্য করতে হলো।

খুড়শাশুড়ি বল্লেন—অমন নোলায় সাত ঝাঁটা মারি। লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খেয়ে দোকানটা শেষ করে দিলে গা! এমন অলক্ষ্মী বৌ তো কখনও দেখিওনি, শুনিওনি। লজ্জাও করে না গুরুজনকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে।

স্বামীকে রাত্রে বল্লাম—আর ওসব এনো না। দ্যাখো তো কি কাণ্ড বাধালে।

স্বামী বল্লেন—না, আনবে না! আমায় কি মাইনে দেয় কাকা? বিনি মাইনের চাকর করে তো রেখেচে। পেটে দুটো খাবো না? ঠিক আনবো লুকিয়ে, তুমি দেখো। কেমন করে ধরবে কাকা তা দেখবো।

স্বামীর শরীর ভাল নয় অথচ ঘোর পেটুক। আমার কথা শুনতেন না। খাবার চুরি বন্ধ হলো না। রোজ রাত্রে একগাদা বাসি লুচিআর রসগোল্লার রস আনেন। নিজে খান, আমাকেও যথেষ্ট দেন। ওঁর পেটের অসুখ ছাড়ে না। আমার বারণ শোনে না মোটে।

বলেন—খেয়ে যা উঠিয়ে নিতে পারি। কাকা একপয়সা উপুড়-হাত করবে না।

আমি বল্লাম—আমি বাপের বাড়ি যাবো আষাঢ় মাসে, আমায় নতুন কাপড় কিনে দেবে না?

উনি ঠোঁট উলটে বল্লেন—কে দেবে? কাকা? তা দেখে আর বাঁচলাম না!

—সত্যি আমার নতুন কাপড় হবে না? বাপের বাড়িতে কিন্তু সবাই নিন্দে করবে।

—যদি আমি দিতে পারতাম, সব হোত। আমার কি ইচ্ছে করে না তোমায় কাপড় দিতে? কোথায় পাবো?

—তাই তো। অনেকের নিন্দে শুনতে হবে তাই ভাবছি।

আষাঢ় মাসে বাপের বাড়ি এলাম। স্বামীও আমার সঙ্গে এলেন। তাঁকে দেখে গ্রামের সমবয়সী মেয়েরা নানা রকম নিন্দাবাদ করতে লাগলো।

আমায় একদিন রায়বাড়ির মেজগিন্নি বল্লেন—হ্যাঁ পাঁচী, জামাই নাকি তাড়ু ঘোঁটে ময়রার দোকানে?

আমি অতশত বুঝি নে, বল্লাম—হ্যাঁ। খুব ভাল খাজা তৈরি করে। সবাই হাতের সুখ্যাতি করে মাসিমা।

মেজগিন্নি হেসেই খুন। তাঁর বড় পুত্রবধূ যে বাপের বাড়ি থেকে আসতে চায় না, বাপের বাড়ির গ্রামে কোনো প্রতিবেশী ছেলের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত, এসব কথা তিনি তখন ভুলে গেলেন। আমার স্বামীর খাবারের দোকানে কাজটাই প্রবল দোষের ও নিন্দের কারণ হয়ে উঠল তাঁর কাছে। আমার স্বামীকে গ্রামের লোকে নতুন জামাই বলে খাতির আদর করলে না। আমার তাতে মনে বড় দুঃখ হলো। নতুন জামাইকে সকলে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়, আমার স্বামীকে সবাই যেন কেমন হেনস্থা করলে।

নসুমামা ঠিক তেমনি ভাত রাঁধচে। আমি তার ওখানে গিয়ে গল্প করে একটু যা আনন্দ পেতাম। একটা জিনিস দেখলাম, নসু ধর্মে-কর্মে মন দিয়েচে এই বয়সেই। চন্দন ঘষচে দেখে বল্লাম—দিদিমা পুজো করেন বুঝি আজকাল? নসু হেসে বল্লে—মা নয়। পুজো করবো আমি। রোজ শিব গড়িয়ে পুজো করি। মানুষ হয়ে জন্মে শুধু খেয়ে যাব শুয়োরের মত!

আমার হাসি পেল ওর মুখে তত্ত্বকথা শুনে। নসুমামা আমাকে শসা কেটে খেতে দিল, নিজেই নারিকেলের নাড়ু করেচে ঘরে, তা দিলে, চা খেতে দিলে।

বছর দুই-তিন কাটলো। আমার স্বামীর শরীর সারলো না। ক্রমেই যেন আরও খারাপ হয়ে উঠচে। শাশুড়ি ও খুড়শাশুড়ি বলেন—ওই অলুক্ষণে বৌ এসে বাছার শরীর একদিনও ভাল গেল না।

শাশুড়ি বল্লেন—সংসারের কোনো জিনিসে আঁট নেই তা দেখেছ লক্ষ্য করে?

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়, এ আমিও স্বীকার করচি। সত্যিই যেন আমার কোনো জিনিসে কোনো আসক্তি নেই। ভাল কাপড় নয়, গহনা নয়—কোনো কিছুতে না। আমার স্বামী বলেন—পয়সা জমাও না কেন? যা মাঝে মাঝে হাতে এনে দিই, জমিয়ো। তোমার আখেরে ভাল হবে।

ওসব কথা আমি শুনেও শুনিনি কোনো দিন। কার আখেরে কি হবে সে ভেবে ফল কি!

আমার একটি ছেলে হলো, কয়েক মাস পরে মারাও গেল। স্বামীর অসুখ সারে না। সংসারে খেটেই মরি, মুখের মিষ্টি কথা কেউ বলে না। স্বামী আমায় নানারকমসাংসারিক উপদেশ দেন। তাঁর যে রকম শরীর, কবে মরে যাবেন, তখন কি উপায় হবে? আমি যেন কিছু কিছু হাতে রাখি। এ কথা আমি যখন শুনি তখনই মনে থাকে, তারপর আর মনে থাকে না।

সেই মাঘ মাসে আমি বাপের বাড়ি এলাম। গ্রামে এসে শুনি নসুমামার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে, সে দিন-রাত পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকে, কারও সঙ্গে কথা বলে না,কি রকম যেন। আমি গিয়ে দেখা করলাম বিকেলের দিকে। নসুমামা বল্লে কি খবর পাঁচী, কখন এলি?

—কাল এসেছি। ভাল আছ?

—ভাল আছি। খুব আনন্দে আছি।

—সবাই তোমাকে পাগল বলচে যে?

নসুমামা মৃদু হেসে চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আমি আসল বস্তু পাওয়ার চেষ্টায় আছি। এতে যে যা বলে বলুক। আমি পাগলই হই আর ছাগলই হই—হি-হি—হি-হি—হ্যাঁরে পাঁচী?

শেষের কথাগুলো আমার কানে একটু অসংলগ্ন-মত ঠেকলেও নসুমামার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কি যেন একটা ওর মধ্যে আমি পেলাম, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখিনি। ওর মুখের চেহারা যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। লোকে টাকাকড়ি ঘর-জমি আঁকড়ে পড়ে আছে দেখচি আমার চারিপাশে, খুড়শাশুড়িকে দেখেছি গাছের সামান্য একটা আম যদি গাছের তলা থেকে কোনো-বাড়ির ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে যায় তবে ঝগড়া করে পাড়া মাত করেন। গাঁয়ের মধ্যে দেখেচি এক হাত জমি হয়তো এগিয়ে বেড়া দিয়েছে কেউ, তাই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা দু-তিন বছর ধরে চলেচে। এমন আবহাওয়ার মধ্যে নসুমামা মানুষ হয়েও স্বতন্ত্র, ওর কাপড়ে-চোপড়ে, খাওয়ায়, বিষয়-আশয়ে কোনো আসক্তি নেই; পৈতৃক বিষয় আছে, কিন্তু ভায়েদের দিয়ে বসে আছে সর্বস্ব, একটা পয়সাও চায় না।

আমার স্বামী এসে দু-চারদিন রইলেন। স্বামীর ওপর আমার কেমন একটা মায়া হয়। এর মুখের দিকে কেউ যেন চায় না আমার শাশুড়ি ছাড়া—তাও তিনি বুড়ো হয়েছেন, দেওরের কাছে কোনো কথা তাঁর খাটে না।

আমাদের গ্রামেও তাঁর তেমন খাতিরযত্ন নেই।

বল্লেন—এই গাঁয়ে একটা ঘর করলে ভাল হয়।

আমি বল্লাম—কেন, শ্বশুরবাড়ি বাস করবে? কেউ কিছু বলবে না?

—বলুক গে। কাকার ওখানে আর ভাল লাগে না।

—দেখ ভেবে।

—তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো যেন কেমন কেমন? ভাল করে কথাই বলে না।

আমার রাগ হলো, বল্লাম—তাড়ুঘোঁটা জামাইকে কে খাতির করবে শুনি?

স্বামী হেসে চোখ টিপে বল্লেন—ইঃ! রোজ রোজ রাত্তিরে খাজা খাওয়ার সময়তো খুব ভাল লাগে?

দু-একদিন পরে উনি চলে গেলেন। যাবার সময় আমার হাতে তেরো আনা পয়সা দিয়ে বলে গেলেন—এই পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খেয়ো। মাসখানেক থাকো, তারপরএসে নিয়ে যাবো।

আর আসেননি তিনি। সেই মাসের শেষের দিকে পুরনো আমাশা রোগে তিনি আমার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের শাঁখা ঘুচিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বাবা চিঠি পেয়ে আমাদের প্রথমে কিছু বলেননি, তারপর দুদিন পরে মাকে একদিন বল্লেন—হ্যাঁ একটা কথা, জামাইয়ের বড় অসুখ, চিঠি পেয়েচি।

মা আড়ষ্ট সুরে বলে উঠলেন—সে কি গো! এতক্ষণ বল নি কেন? হাটে চিঠি পেলে? কই দেখি চিঠি।

বাবা আমতা আমতা করে বলেন—তা—ইয়ে—মনে ছিল না। তা নয়—ইয়ে—

আমি কান-খাড়া করে পাশের ঘরে বসে সব শুনচি। আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্ করচে। মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে যেন। জিব শুকিয়ে আসচে। আমি বুঝতে পেরেচি সব। বাবা অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ লোক, জামাইয়ের অসুখ-সংবাদে চুপ করে বসে থাকবার মানুষ নন। মা ছুটে হাঁপিয়ে বাবার কাছে এসে বল্লেন—তার কাছে এখুনি চলে যাও। মেয়ের যাবার কথা লেখেনি? ওকেও নিয়ে যাও—

বাবা শুষ্কমুখে বল্লেন—আর সেখানে গিয়ে কি হবে গিন্নি। সব শেষ হয়ে গিয়েচে!

মা মেঝের ওপর আছড়ে পড়লেন আর্ত চিৎকার করে। আমি কিন্তু বেশ সহজ ভাবেই কথাটা শুনলাম কারণ আমি আগেই বুঝতে পেরেচি বাবা কি বলবেন।

এইভাবে আমার বিবাহিত জীবনের ইতি হয়ে গেল। কি করবো, আমার অদৃষ্ট। বাবা তো বুড়োহাবড়া স্বামীর হাতে আমায় দেননি, ছোকরা দেখে দিয়েছিলেন, আমার কপালের লেখা, কারও দোষ নেই। আমার কিন্তু বিশেষ কোনো দুঃখ নেই মনে। বিশেষ কিছু যে হারিয়েচি, বিশেষ কোনো অভাববোধ নেই। লোকে বলচে আমার নাকি সর্বনাশ হয়ে গেল। কি সর্বনাশ হলো কিছু বুঝতে পারচি নে। মাছ খেতে পাবো না, না-ই বা পেলাম; একাদশী করতে হবে, করবো। ভাল খাওয়া বা পরার দিকে আমার কখনও কোন ঝোঁক নেই। তবে মানুষটার ওপর মায়া জন্মেছিল বটে। তাকে আর দেখতে পাবো না, এইটুকু যা কষ্ট।

বিধবা হওয়ার পরে আমি অনেকবার শ্বশুরবাড়ি গেলাম।

শাশুড়ির সেবা করি, মুখরা জায়ের সংসারে পুত্রহীনা বৃদ্ধার বড় কষ্ট, যত দূর পারি সেটুকু ঘোচাবার চেষ্টা করি। একাদশীর দিন শাশুড়ি-বৌয়ে নিরম্বু উপোস করি, সন্ধ্যের সময় তাঁর পায়ে তেল মালিশ করি।

খুড়শাশুড়ি সর্বদা শোনান, আমি অলুক্ষুণে বৌ, আমায় ঘরে এনেই তাঁর সোনার চাঁদ ছেলে, দুধের বাছা মারা গেল।

ভাসুরপোর ওপর এমন স্নেহ ভাসুরপোর জীবদ্দশায় কোনোদিন দেখেচি বলে মনেকরতে পারলাম না। আশ্চর্য!

একবার বাপের বাড়ি এসে শুনলাম নসুমামা বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে। ছ'মাস পরে খবর এল হালিসহরের এক কালীমন্দিরে সে আছে, গঙ্গার তীরে দুখানা ভাঙা মন্দির, সেখানে সে পুজো-আচ্চা নিয়েই নাকি আছে।

খবরটা দিলে ও-পাড়ার বুধো গয়লার মা, ঘোষপাড়ার দোল দেখে দেশে ফেরবার পথে সে হলিসহরে গিয়েছিল, সেইখানেই দেখা হয়েচে। আমি মনে মনে ভাবলাম ওর পক্ষে ভালই হয়েচে। কি জানি কেন আমার মনে হয় নসুমামা যা করে তাই ভাল।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটে। বৃদ্ধা শাশুড়িকে কত যত্নে আগলে নিয়ে বেড়াই, বাপের বাড়ি গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারিনে, পাছে বুড়ির কষ্ট হয়। একদিন শাশুড়ি বল্লেন—চল মা, সান্যাল মশায়ের বাড়ি ভাগবত শুনে আসি—

—সে কে মা?

—পাড়ার বুড়ো সান্যাল দাদা, দ্যাখোনি বুড়োকে?

সান্যাল মশায়ের বাড়ি গেলাম। ওঁর অবস্থা বেশ ভাল বলে মনে হলো বাড়িঘর দেখে, শুনলাম দুই ছেলে কলকাতায় চাকরি করে, তাদের স্ত্রী-পুত্র তাদেরই সঙ্গে কলকাতার বাসায় থাকে। সান্যাল মশায় বিপত্নীক। বয়স ছিয়াত্তর বছর, নিজেই বল্লেন। একটি বিধবা বোন বাড়িতে থাকে ও রান্না বান্না করে। আমাদের দেখে খুব যত্ন করলেন, আমাদের সামনে ভাগবত ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

সেই থেকে সান্যাল মশায়ের বাড়িতে রোজ যাই। আমায় তিনি বড় ভালবাসেন, যোগবাশিষ্ঠ ও ভাগবত তাঁর প্রিয় বই। যদি দু'দিন না যাই, সান্যাল মশায় আমার শ্বশুরবাড়ি আসবেন। আমার শাশুড়ি তাঁর বৌমা। ডেকে বলেন—ও বৌমা?

বৃদ্ধা শাশুড়ি মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বলেন—কি দাদা?

—নির্মলা (আমার ভাল নাম) কোথায়? ডেকে দাও।

আমি বের হয়ে এসে বলি—কি দাদু?

—দাদু কি রে, তোমার জ্যাঠামশাই হই। তোমার শ্বশুরের চেয়ে এগার বছরের বড় আমি। আমার ওখানে ক'দিন যাওনি কেন? আজ অবিশ্যি যাবে।

আবার নিয়মিত ভাবে যাই। সান্যাল মশায় আজকাল আর কোনো শ্রোতা চান না, আমার মধ্যে কি যে দেখেচেন—আমাকে পেয়ে খুব খুশি। যোগবাশিষ্ঠ পাঠ জমে না আমি না গেলে।

একদিন তাঁকে বল্লাম—জ্যাঠাবাবু, আমি তো মুখ্যু মেয়েমানুষ, আমার মধ্যে কি পেলেন আপনি?

—কি পেলাম কি জানি। কিন্তু তুমি এলে মা আমার গীতা আর যোগবাশিষ্ঠ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। ওদের শ্লোকের মধ্যে থেকে নতুন ভাষ্য বেরিয়ে আসে। আনন্দ যদিশাস্ত্র-আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটার ষোল আনাই পাই তুমি আসলে মা।

আমি হেসে বল্লাম—তাহলে বলুন জ্যাঠামশাই, আমার মত শ্রোতা আপনি অনেকদিন পাননি?

—সত্য মা, এতদিন জানতাম না যে লোককে শুনিয়ে এত আনন্দ হয়। নিজেই চর্চা করতাম, এই পর্যন্ত। আজ কিন্তু অন্যরকম বুঝচি। উপযুক্ত শ্রোতা পেলে—

আমারও ভাল লাগে বলেই যাই। কেমন যেন মন বদলে যাচ্চে, যে মন আমার কোনো কালেই সংসারে ছিল না—তা আরও নিরাসক্ত হয়ে পড়েচে। বন্ধনের মধ্যে কেবল বৃদ্ধা শাশুড়ি। বৃদ্ধা কাঁদেন, আমি বসে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ শোনাই। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভেজে না। ঘোর বিষয়ী মন। এ বয়সেও কাঁটালের ভাগ নিয়ে, সজনে ডাঁটার ভাগ নিয়ে খুড়শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া। আমি বলি—মা, কি হবে আপনার এঁচড় আর সজনেডাঁটার চুলচেরা ভাগে। ওর কি সার্থকতা?ভগবানের নাম করুন।

বাতাবী লেবু-ফুল ফুটলো ফাগুন মাসে—পথে পথে অপূর্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে। ঘেঁটুফুলে বাঁশবনের তলা ভর্তি হয়ে গেল। কোকিলের ডাকে মন উদাস হয়ে ওঠে, কত কথা ভাবি। বাল্যকালের কথা, মা-বাবার কথা, স্বামীর কথা—জীবনে কিছু না পেয়েই যেন সব-কিছু পেয়েচি। যদি কোনো হিসাবী বিষয়ী লোক বলে, কি পেয়েচ, হিসেব দেখাও—হয়তো কিছু দেখাতে পারবো না—কারণ বাইরে আমার অধর্মলিন সরুপাড় ধুতি আর দুগাছি অতি সরু বিবর্ণ সোনার চুড়ির মধ্যে কেউ কোনো লাভের সন্ধানই খুঁজে পাবে না, আমার মন বলে কি-এক জিনিসের ঠিকানা মিলেচে, যার দরুন অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার আজ আমার কাছে খোলা। অন্য সব কিছু যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে।

একদিন আমার শাশুড়ি বল্লেন—ও বৌমা, তোমাদের গাঁয়ের একটি ছেলে আমাদের গ্রামে হরি কলুর বাড়িতে এসে চাকরি করচে। বামুনের ছেলে, দিব্যি চেহারা। কিন্তু বাপু, কলুবাড়ি জল তোলে, গরুর জাব কাটে, এ আবার কেমন কথা! বড্ড গরিব বোধ হয়। আমি দেখিনি, কে কাল বলছিল ঘাটে।বল্লে, বৌমার দেশের লোক।

যেদিন শুনলাম, সেইদিনই পথে নসুমামার সঙ্গে দেখা। কিন্তু প্রথমটা চিনতে পারিনি। নসুমামার মাথায় বড় বড় চুল, পরনে শাড়ি, আধ-ঘোমটা দেওয়া, হাতে কাঁচের চুড়ি, মেয়েলি বেশ, অথচ মুখে ঈষৎ গোঁফ-দাড়ি। আমার হাসি পেল ওর এই অপরূপ বেশ দেখে। আমায় দেখে মেয়েলি সুরে বল্লে—ও পাঁচী, ভাল আছিস তো ভাই?

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—তোমার এ কি বেশ নসুমামা?

নসুমামা অদ্ভুত হাসি হেসে বল্লে—এই, থাকলেই হলো একরকম।

—তুমি নাকি কলুবাড়ি বাসন মাজো, জল তোলো?

—দোষ কি?

—তুমি যা ভাল বোঝো।

বৃদ্ধা শাশুড়ি সেই শ্রাবণ মাসে দেহ রাখলেন। দিন-দশেক জ্বরে ভুগে গভীর রাত্রে মৃত্যুর কিছু পূর্বে অশ্রুভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে কার কাছে রেখেযাচ্চি মা?

বৃদ্ধার আকুল সুরে মনে ব্যথা বাজল আমার। তাঁর জ্বরশীর্ণ হাত-দুটি ধরে বল্লাম—কেন, আমার সোনার চুড়ি আছে, এক বিঘে আমন ধানের জমি আছে—ভাবনা কি মা আমার?কিছু ভেবো না আমার জন্যে।

বিষয়ী লোককে বিষয়ের ভাষায় সান্ত্বনা দিই। আমি জানি যাঁর কাছে আমি আছি, তিনি আমায় কোনোদিন ফেলবেন না, চরণে স্থান দেবেনই।

নসুমামার সঙ্গে দেখা আবার একদিন। সে একগাদা কাপড়-সেদ্ধ নিয়ে ঘাটে যাচ্চে কাচতে। আমি বল্লাম—ও-সব কাজ আমায় দাও নসুমামা। আমি তোমায় করতে দেবো না।

জোর করে সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে নিজে কেচে দিলাম। আমার চোখের সামনে ও-সব খাটুনি খাটতে দেবো না ওকে। বল্লাম—হরি কলুর বাড়ি গোয়াল পরিষ্কার আমি করে দেবো।

—না পাঁচী, লক্ষ্মীটি, লোকে কি বলবে?

—আমি গ্রাহ্য করিনে।

—আমি করি।

—মিথ্যে কথা, তুমি কিছু গ্রাহ্য কর না, কলুবাড়ি বাসন মাজচো অথচ—

—পাঁচী, এ সব তুই বুঝবিনে। ওসব করিসনে কক্ষনো।

ওর কথা সান্যাল জ্যাঠাকে বলতে তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওকে দেখবার জন্যে। হরি কলুর বাড়ির পেছনে একটা পুকুর, পুকুরের চারিধারে আম কাঁঠালের বাগান। তারই একটা গাছতলায় দেখা গেল ও চোখ বুজে বসে। সেই থেকে সান্যাল মশায়ের সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল। যোগবাশিষ্ঠের দলে ভিড়ে পড়লো।

সান্যাল জ্যাঠা বলেন—ছেলেটি শুদ্ধসত্ত্ব।

শীতের প্রথমে কলুপাড়ায় কলেরা দেখা দিল। একদিনে আটারটার কলেরা হলো, পাঁচটা মরে গেল। নসুমামা কি ভীষণ পরিশ্রম করে সেবা শুরু করলে। হরি কলুর ছোট ভাই ওর সেবাতেই নাকি বেঁচে উঠলো। রাত্রে ঘুমোয় না। নিজে হাতে রোগীদের গা ও বিছানা পরিষ্কার করে।

কলেরায় কলুপাড়া উজোড় হয়ে গেল—ধরলে কিছু দূরে মুচিপাড়াকে। ভয়ে তখন মুচিপাড়ার অনেক লোক পালিয়েছে। বুড়ো হিরু মুচি একদিনের অসুখে মারা গেল। কিন্তু তখন এমন ভয় হয়ে গিয়েচে সকলের, মড়া ঘরের মধ্যে পড়ে রইল সারাদিন, কেউ ফেলতে চায় না। সন্ধ্যের পর নসুমামা একা গিয়ে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ফেলে দিয়ে এল খালের ধারে শ্মশানে।

যোগবাশিষ্ঠের আসরে একথা শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমিও যাবো, নসুমামাকে সাহায্য করবো। লোকে যে যা বলে বলুক গে।

জ্যাঠামশায় হেসে বল্লেন—মা, এ কাজ তোমার নসুমামার। তোমার জন্যে নয়।সব কাজে অধিকারী-ভেদ আছে।

—কেন? আমার অধিকার জন্মায়নি?

—তোমার বুড়ো শাশুড়ি মরে গিয়েচে, জগতে আরও কি বুড়ো হাবড়া নেই?

—আপনি বলুন নসুমামাকে। ও আমাকে নিতে চায় না কোনো কাজে। আমি যাবো, জ্যাঠামশায়।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন নসুমামা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। কলুপাড়ায় সবাই হায় হায় করতে লাগলো। খুড়শাশুড়ি বল্লেন—ভালই হলো চলে গেল, সুবুদ্ধি হয়েচে। বামুনের মুখ অমন করে হাসাতে হয়? ছিঃ ছিঃ—

তারপর মুখ টিপে হেসে বল্লেন—বৌমার বাপের বাড়ির লোক। খুব কষ্ট হয়েচে বৌমা তোমার—না? যখন-তখন দেখা হোত তো! অন্য গাঁ থাকতে এ গাঁয়ে এসেছিল সেজন্যেই হয়তো, তবুও তো দেশের ঘরের লোক আছে একটা।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত সটাং সোজা হয়ে বলে উঠি—নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট তো হবারই কথা।

হরি কলু একদিন সান্যাল জ্যাঠার কাছে বল্লে—অমন মানুষ হয় না। ছোট ভাইটা বেঁচে উঠলো, পায়ে ধরতে গেলাম, বলি তুমি ব্রাহ্মণ, আমার ঘরে হেনস্থা কাজ আর করতে দেবো না। দু'মাসের মাইনে বাকি, একটা পয়সাও নিয়ে গেলেন না যাবার সময়। হঠাৎ পালিয়ে গেলেন। আমায় যেন ক্ষ্যামা করেন তিনি।

হাত জুড়ে সে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

আবার ফাল্গুনে বনে বনে ফুল ফুটেছে। আবার কোকিলের ডাক পথে পথে। মুচকুন্দ চাঁপার সুগন্ধে ঘাটের রানা ভুরভুর করে। আমি একদিকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। জ্যাঠামশায়ের বৈঠকখানায় যোগবাশিষ্ঠ শুনতে যাই রোজ বিকেলে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়েই বোধ হয় সেখানে পৌঁছুতে হয়।